মাখদুমা আক্তার

৫ অক্টোবর ২০২২

আমি মাখদুমা আক্তার, আমার জন্ম ১৯৮৩ সালের পয়লা জানুয়ারি খুলনায়। আমার ভোর কাটে ব্যস্ততায়, বাচ্চাদের তৈরি করে নাশতা বানিয়ে স্কুলে পৌঁছে দিয়ে সকালের নাশতা করি। তৈরি করা আর নাশতা বানানোর কাজটা আমি আর আমার স্বামী ড. জাহিদুর রহমান মিলে পালাক্রমে করি। আমি কাজ করি কেয়ার সাপোর্ট ওয়ার্কার হিসেবে, কারণ সেখানে শিফট বাছাই করার সুযোগ রয়েছে। যেদিন জাহিদ বাড়িতে ছেলেমেয়েদের দেখাশোনা করতে পারবে, সেদিন আমি কাজের শিফট নিই।

আমার তিন বাচ্চা, ইয়াশফিন, ইউসরা আর আরওয়া। বড় ছেলে ইয়াসফিন এখানকার পরিবেশে বড় হচ্ছে কিন্তু ও বাংলা শিখতে খুব আগ্রহী। সব শব্দের বাংলা সে শিখতে চেষ্টা করে। যখন আমার বাবা-মা এখানে বেড়াতে আসেন, সে চেষ্টা করে উনাদের কাছ থেকেও বাংলা শিখতে। গীটারে সে আমাদের জাতীয় সঙ্গীত আমার সোনার বাংলা সুরটা তুলেছে। আমি ওকে নিয়ে খুব গর্বিত। আমি চাই আমার বাচ্চারা বাংলা শিখুক, বাংলা সংস্কৃতি- ইতিহাস জানুক।

আমার বাবা মোহাম্মদ মোসলেম উদ্দিন আহমেদ, মা সাহারা বানু। দুজন বেশিরভাগ সময় খুলনাতে থাকেন, মাঝে মাঝে ঢাকায় আমার ভাইদের কাছে থাকেন। প্রতি মুহূর্তে আমি তাঁদের অভাববোধ করি। কোভিড অতিমারীর জন্য গত তিন বছর আমরা বাংলাদেশে যেতে পারিনি, বাবা-মাকে দেখবার জন্য অধীর হয়ে উঠছিলাম। খোদার ফজলে আবার তাঁদের সঙ্গে দেখা হয়েছে, বাচ্চারাও খুব আনন্দ করেছে নানা-নানীর সঙ্গে। বাবা-মা কয়েকবার এসেছেন এখানে। আবার কবে দেখা হবে তাই ভাবছি।

আমরা দুই ভাই এক বোন, আমি সবার ছোট। আমি তাঁদের অনেক আদরের বোন। আমার বড় ভাই সুলতান আহমেদ রাসেল, এক্স আর্মি অফিসার, এখন প্রাইভেট চাকরি করছেন, আর ছোট ভাই শাহরিয়ার আহমেদ এয়ারফোর্সে জিডি-পাইলট ছিলেন, দুই বছর হয় রিটায়ার করেছেন, এখন একটা প্রাইভেট কোম্পানিতে পাইলট হিসেবে কাজ করছেন। দুজনেই নিজেদের সংসার-সন্তান নিয়ে সুখী। আমি বড় ভাগ্যবতী বোন, কারণ আমার বাচ্চাদের আমার ভাইরা নিজের সন্তানের মতো আদর করেন। অবশ্য বাচ্চাদের চাচারাও একই রকম আদর করেন। কাজের কারণে সবাই দূরে দূরে থাকেন, কিন্তু আমরা যখন একত্র হই, তখন টের পাই পারিবারিক বন্ধন কত দৃঢ়। বাংলাদেশে আমাদের সময়টা দ্রুত শেষ হয়ে যায়। প্রতি বছর অপেক্ষায় থাকি কবে দেশে যাব, কবে সবার সঙ্গে মিলিত হবো।

বাংলাদেশ থেকে ছুটি শেষে যখন ফিরে আসি, তখন আমার ভাইরা আমাদের লাগেজ গুছিয়ে দিয়ে আমাদের এয়ারপোর্টে নিয়ে যান। ওঁদের এসব কাজ দেখলে মনে হয়, ওঁরা ভাবেন ওঁদের ছোট্ট বোন কিছু করতে পারবে না। এবার যখন আমি ফিরি, আমার ছোটভাইয়ের ফ্লাইট ছিল। আমার মনটা একটু খারাপ ছিল যে, প্রতিবার ছোটভাই আমার কাজগুলো করে দেন, আমাকে একটুও দুশ্চিন্তা করতে হয় না, এবার আমার কাজগুলো কে করে দেবে? তিনি বললেন, তিনি যতটুকু পারেন আগেই তৈরি করে দেবেন সব। আমি শেষ মুহূর্তে দুঃখ করে বললাম, আমি যখন বাড়ি ছাড়ব তখন তোমায় একবার দেখতে পাবো না? ভাই আশ্বাস দিলেন, তিনি দেখবেন কী করা যায়। তিনি ফ্লাইটে চলে গেলেন, বড়ভাই অফিসে গেলেন, সবাইকে বিদায় দিয়ে আমি যখন এয়ারপোর্টে ঢুকছি, দেখি ছোটভাই ফ্লাইট শেষ করে আরেকদিক দিয়ে বের হয়ে আসছেন। নিজের দায়দায়িত্ব ঠিক রেখে একদম সময়মতো তিনি আমাদের সঙ্গে এসে শেষ দেখা করলেন। এটা আমার অত্যন্ত আনন্দের স্মৃতি।

আমার স্কুল ছিল খুলনার বিখ্যাত ক্যান্টনমেন্ট গার্লস স্কুল। স্কুলের স্মৃতি সোনালি স্মৃতি, যখন স্কুলে ছিলাম ভাবতাম কবে বড় হবো, কলেজে যাব, ইউনিভার্সিটি যাব! বুঝতাম না সুবর্ণ সময় আসলে তখনই পার করছি। গার্লস স্কুলে পড়েছি, পরে বিএল মহিলা কলেজে পড়েছি, মাস্টার্স করেছি বিএল কলেজে, সবই খুলনার ভেতর। বাবার একমাত্র মেয়ে তো, বেশি দূরে যেতে ভয় পেতাম। পড়ালেখা শেষ হবার পর বিয়ে হলো, তারপর তো বিদেশেই চলে এলাম। স্কুল-কলেজে আমার খুব বেশি বন্ধুবান্ধব ছিল না, খুব একটা মিশতে পারতাম না আমি বা বেছে বেছে মিশতাম। এখন বাংলাদেশ-আমেরিকা-অস্ট্রেলিয়া-কানাডায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা বন্ধুদের সঙ্গে হোয়াটস্যাপে কথা হয়, ভালো লাগে।

আমার আর জাহিদের প্রথম দেখা হয় খুলনার একটি পারিবারিক অনুষ্ঠানে। এরপর আরো কয়েকবার আমাদের দেখা হবার পরে আমাদের দুজনারই মনে হলো, আমাদের সম্পর্ক নিয়ে আমরা আরেকটু ভাবতে পারি, একসঙ্গে পথ চলতে পারি। সিদ্ধান্ত নেয়া এত সহজ ছিল না, কারণ নিজেরা সিদ্ধান্ত নিলে পরিবার থেকে শুরুতে ইতিবাচক সাড়া বা সহযোগিতা পাওয়া যায় না। পরিবার চায় তাদের সিদ্ধান্ত যেন আমরা মেনে নিই। তবু আমরা চেষ্টা করলাম পরিবারকে বুঝিয়ে শুনিয়ে রাজি করাতে, যেন তাঁদের সবার শুভকামনা আর দোয়া নিয়ে আমাদের সামনের পথ চলা সহজ হয়। আমাদের পরিবার সেটা করেছে, ফলে আমরা তাঁদের প্রতি কৃতজ্ঞ। বিয়ের এক মাস পার হতেই আমরা সৌদি চলে যাই, ওখানেই আমাদের প্রথম সংসার পাতি, ওখানেই প্রথম সন্তান ইয়াসফিনের জন্ম। সময়ের সঙ্গে মানুষের ব্যবহার, চিন্তাভাবনা, প্রত্যাশা সবই পালটায়, সেটাই স্বাভাবিক। আমাদের দুজনেরও নিশ্চয়ই পাল্টেছে। তবে আমি সৌভাগ্যবতী যে আমার স্বামী চমৎকার একজন বাবা। এতই ভালো যে এর বেশি আমি প্রত্যাশা করি না।

প্রথম যখন নরউইচে এসেছি তখন আমরা এখানকার কোনো বাঙালি পরিবারকে চিনতাম না। মনে হতো ঈদে বা অন্যান্য উৎসবে আমরা কীভাবে সময় কাটাবো? কেনাকাটা করতে গিয়ে অনেক বাঙালিকে দেখতাম, কিন্তু কথা বলতে গিয়ে সবসময় ইতিবাচক সাড়া পেতাম না, ভাষার রকমফেরের কারণে একটা বাধা ছিল হয়তো। কয়েক মাস যেতে নরউইচের আরো কিছু বাঙালি পরিবারের সঙ্গে পরিচয় হলো। এখন তো নরউইচে আমরা বেশ বড়সড় একটা কমিউনিটি। সুযোগ পেলেই আমরা পার্টির পরিকল্পনা করি।

বাঙালি হিসেবে আমার একটা প্রশ্ন রয়েছে। এখানে যদি বাচ্চাদের বাংলা ভাষাটা পড়াবার জন্য কোন ব্যবস্থা থাকতো তাহলে বেশ ভালো হতো। বাচ্চারা বাংলা বলতে পারে, কিন্তু লিখবার আর পড়বার যে প্রাথমিক জ্ঞানটুকু জরুরি, সেটা তাদের নেই। এ ব্যাপারে আমরা কাউন্সিল বা সেন্টারের সহযোগিতা আশা করছি।